একক ৪২ ☐ বিবিধ প্রবন্ধ ঃ গীতিকাব্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গঠন

৪২.১ উদ্দেশ্য

৪২.২ প্রস্তাবনা

৪২.৩ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথা

৪২.৪ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য

৪২.৫ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্য

৪২.৬ মূল পাঠ ঃ প্রবন্ধের প্রথমাংশ

৪২.৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

৪২.৮ সারাংশ-১

৪২.৯ অনুশীলনী-১

৪২.১০ মূলপাঠ ঃ প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ

৪২.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

৪২.১২ সারাংশ-২

৪২.১৩ অনুশীলনী-২

৪২.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

৪২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি বঙ্কিমচন্দ্রের—

- গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন ;
- গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

৪২.২ প্রস্তাবনা

সাহিত্যের নানা Form বা 'রূপ' আছে। 'কবিতা' সেই সব নানা 'রূপে'র একটি। আবার, 'কবিতার'ও আছে নানা Form বা 'রূপ'। 'লিরিক' বা 'গীতিকবিতা' [বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে, 'গীতিকাব্য' অভিধাটিই প্রচলিত ছিল বলে তিনি 'গীতিকাব্য' অভিধাই ব্যবহার করেছেন।] তারমধ্যে একটি। বর্তমান প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকবিতার স্বরূপ এবং প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। গীতিকবিতা সম্পর্কে এটিই বাংলায় সর্বপ্রথম আলোচনা। অবশ্য প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল, নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' নামে একটি গীতিকবিতা সংকলনের সমালোচনা রূপে। গীতিকবিতা নিয়ে তখনকার শিক্ষিত বাঙালির মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সেই অভাব ঘুচিয়েছেন। নাটক বা আখ্যায়িকার প্রকৃত রূপ সম্পর্কেও শিক্ষিত বাঙালির কোনো ধারণা ছিল না। বাইরের অবয়ব বা আকৃতি দিয়েই

তাঁরা এগুলির স্বরূপ নির্ধারণ করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল,—কথোপকথনের আকারে কিছু রচনা করলেই তা নাটক হয়ে যায় ; কিংবা টানা গদ্যে কিছু রচনা করলেই তা উপন্যাস হয়ে যায়। আসলে সাহিত্যের মূল স্বরূপ নির্ভর করে রচনাটির আন্তর সত্তার উপর, বাইরের কোনো রূপ বা অবয়বের উপরে নয়। এই অর্থে—কথোপকথনের আকারে লিখলেও তা কাব্য হতে পারে ; কিংবা, আখ্যানের আকারে লিখলেও। মূলত বাঙালি বা বাংলা সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হলেও আলোচনার পটভূমিকাটি কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গীতিকবিতা। সে হিসেবে রচনাটির একটি ব্যাপকতা ও সমগ্রতা আছে। গীতিকবিতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য থেকে তার দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন। এখানেই এ প্রবন্ধটির বিশিষ্টতা ধরা পড়েছে।

৪২.৩ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথা

ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র (জন্ম ঃ ২৬শে জুন, ১৮৩৮। মৃত্যুঃ ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪)। ভারতের স্বাধীনতা মন্ত্রের প্রথম উদ্‌গাতা। পিতা যাবদচন্দ্র ছিলেন মেদিনীপুরে ডেপুটি কলেকটর। যাদবচন্দ্রের চার পুত্র—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। প্রকৃত বাল্যশিক্ষার শুরু মেদিনীপুর, এফ টীড নামে এক ইংরেজ শিক্ষকের স্কুলে। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে কাঁটাল পাড়ায় ফিরে এসে সংস্কৃত বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন। এ বছরই ভর্তি হন হুগলী কলেজে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে এখানেই লেখাপড়া করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮মার্চ, ১৮৫৩) তাঁর কবিতা 'কামিনীর উক্তি' পত্রস্থ হলে এর জন্য পুরস্কার পান-কুড়ি টাকা। 'সংবাদ প্রভাকর' ছাড়াও 'সংবাদ সাধু বঞ্জনে তাঁর গদ্য-পদ্যাদি রচনা বের হতে থাকে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে আইন পড়বার জন্য তিনি ভর্তি হলেন—প্রেসিডেন্সি কলেজে। এখানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে পাশ করেন বি.এ.। এ বছই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর নিযুক্ত হন—যশোহরে। চাকুরি জীবন থেকে অবসর নেন—১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯১। তাঁর প্রতিভা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে বিরোধিতার জন্য আশানুরূপ উন্নতি করতে পারেননি। বাল্যকালে তাঁর এক বিবাহ হয়, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তিনি রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পুত্র সন্তান ছিল না। তিন কন্যা ঃ শরৎকুমারী, নীলাব্জ কুমারী এবং উৎপলা কুমারী।

প্রথম চাকুরি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যখন যশোহরে গেলেন, তখন তার সঙ্গো সেখানে দীনবন্ধু মিত্রের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেন। এ দু'জনের পারস্পরিক সাহচর্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ফলদায়ক হয়েছিল। 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সাহিত্য জীবনের এক পরিপোষক ছিলেন। কিশোরী চাঁদ মিত্র-সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায়, ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে থেকে ধারাবাহিকভাবে একটি ইংরেজি উপন্যাস লিখতে থাকেন—'Rajmohon's wife'। তখন তিনি খুলনায়। তারপর বের হল প্রথম উপন্যাস—'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ; ক্রমে 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)। এর মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' তাকে বিশেষভাবে বিখ্যাত করে তোলে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) থাকাকালীন সময়টি (১৮৬৯-১৮৭৪) খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল। এখান থেকেই বের হয় তাঁর বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা—'বঙ্গাদর্শন' (এপ্রিল, ১৮৭২)। এই পত্রিকাকে অবলম্বন করে, বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে, এক সাহিত্যিক গোষ্ঠীর জন্ম হয়, যাঁরা পরবর্তীকালে এক মননধর্মী ও সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যধারার প্রবর্তন করেন। 'বঙ্গাদর্শন' এক নাগাড়ে চার বছর চলে বন্ধ হয়ে যায়। দু বছর এর কোনো প্রকাশ ঘটেনি। ১২৮৪ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত, সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায়, পত্রিকাটি আবার বের হতে থাকে। এ বছর নবম খণ্ডটি বের হবার পর তাও শেষে বন্ধ হয়ে যায়। এ পর্যন্ত বের হত সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায়। অতঃপর সম্পাদক হন—শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিচন্দ্রকে 'সব্যসাচী' আখ্যা দিয়েছিলেন। একদিকে নিজে যেমন সৃষ্টিকর্মে রত ছিলেন, অপর দিকে অক্ষম রচনাবলীর "ধূম ও ভস্মরাণি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।" বঙ্গাদর্শনে প্রথম সংখ্যা

থেকেই 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বের হতে থাকে। ক্রমে 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'রাধারানী' প্রভৃতি ছোটো বড়ো রচনা প্রকাশ পেল। সঞ্জীবচন্দ্র যখন 'বঙ্গাদর্শনে'র সম্পাদক, তখন পত্রস্থ হয়—'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল,' 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ'। 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য' ও 'বিজ্ঞান রহস্য'-প্রভৃতি রচনাও তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক। বঙ্কিচন্দ্রের শেষের দিকে উপন্যাসগুলি এক বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত। স্বাদেশিকতা এর প্রধান দিক। 'রাজসিংহ' উপন্যাসটিকে এজন্যে তিনি বিস্তৃততর করেন (১৮৮২ এবং ১৮৯৩-তে)। 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪) সীতারাম (১৮৮৭) উপন্যাসে তার সেই ভাবনা রূপ পায়। 'সীতারাম'ই তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস। অতঃপর তিনি 'নবজীবন' এবং 'প্রচার পত্রিকায়', ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, হিন্দু ধর্মের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় রত হন। প্রচারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়—'কৃষ্ণচরিত্র' ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'কৃষ্ণ চরিত্রে'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, সম্পূর্ণ গ্রন্থটি বের হয়—১৮৯২ তে। 'কৃষ্ণচরিত্র' বঙ্কিম প্রতিভার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'নবজীবন' পত্রিকাতেও তিনি 'ধর্ম জিজ্ঞাসা' ও 'অনুশীলন' তত্ত্ব নিয়ে লিখতে থাকেন। 'ধর্মতত্ত্ব' প্রথম ভাগ, 'অনুশীলন' নামে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বের হয়। 'প্রচারে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ব্যাখ্যা লিখতে আরম্ভ করে শেষ করে যেতে পারেননি। বৈদিক যুগের পটভূমিকায় একটি উপন্যাস লিখবার পরিকল্পনা থাকলেও তাও অ-রচিতই থেকে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় অবস্থিত, সেই সময় তিনি 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা 'ভারতবর্ষীয় সভা'র সভ্যপদ লাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হন। সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অফ ইয়ং মেন' (পরবর্তী কালে এটির নাম হয়—'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট')-এর সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে 'Companion of the Indian Empire' (সংক্ষেপে C.I.E.) উপাধি দিলে তা নিয়ে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সুশাসক ও সুবিচারক ছিলেন। শিক্ষা, কৃষি, বিজ্ঞান—প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল উদার ও মুক্ত। যৌবনে তিনি ফরাসী দার্শনিক Comte-এর Positivism মতবাদে বিশ্বাসী হন। এছাড়া অন্যান্য পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও তাঁকে প্রভাবিত করেন।

৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪ (২৬শে চৈত্র, ১৩০০ বঙ্গাব্দে) তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৪২.৪ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য

'প্রবন্ধ' কথাটির মূল অর্থ 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। ভাবের বন্ধন, যুক্তির বন্ধন, ছন্দের বন্ধন, বাক্যের বন্ধন। সংস্কৃতে ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' কথাটি সাহিত্যে কোনো নির্দিষ্ট Form বা রূপকল্পকে বোঝাত না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন গদ্যের সুস্পষ্ট প্রবর্তন ঘটল, তখন গদ্যে লেখা বিষয়বস্তু প্রধান রচনাকে 'প্রবন্ধ' বলা হতে থাকল। কখনও বা 'প্রবন্ধকে' 'প্রস্তাব' ও বলা হয়েছে। মোটামুটিভাবে ইংরেজি Essay এবং বাংলা প্রবন্ধ সমার্থক। Essay-কে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হল—বিষয়বস্তুভিত্তিক, Objective রীতিসম্পন্ন, নৈর্ব্যক্তিক গদ্য রচনা। অপরটি রচয়িতার মানস ও ব্যক্তিত্ব ভিত্তিক, Subjective রীতিতে রচিত। বাংলা প্রবন্ধকেও এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধধারার প্রথম ধারাটি।

এই প্রথম ধারাটির উদ্ভবের ও পরিপুষ্টির পেছনে কয়েকটি বিশেষ দিকে ভূমিকা লক্ষণীয়। প্রথমত, বাংলা গদ্যের সুস্পষ্ট প্রবর্তন। দ্বিতীয়, বাঙালির জীবনে বিশ্বের বিবিধ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তা ও মানসিকতা। তৃতীয়ত, সাময়িক পত্রের প্রকাশ, যে সাময়িক পত্রগুলিতেই বিবিধ সাময়িক ঘটনা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। চতুর্থত, ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু ব্রাহ্ম-খ্রিস্টানধর্মকে অবলম্বন করে যে নানা তর্কালোচনা চলতে থাকে, তারই প্রতিক্রিয়ায় সাময়িক পত্রাদিতে নানা প্রবন্ধ রচিত হয়। পঞ্চমত, এই প্রবন্ধ ধারাটিকেই অবলম্বন করে একদিকে বাঙালির মননশক্তির যেমন বিকাশ ঘটতে থাকে, তেমনি বাঙালির গদ্য রচনাও

বিবর্তিত উন্নততর হতে থাকে। ষষ্ঠত, এই প্রবন্ধধারাটিকে বাঙালির রেনেসাঁসের একটি দিক বলে মনে করা যেতে পারে। বাঙালির সাংস্কৃতিক মনীষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল প্রবন্ধসাহিত্য। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ সকলেই প্রবন্ধ রচনা করে এবং ভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

বাংলা প্রবন্ধের ইতিহাসটিকে কয়েকটি পর্বে বা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভাগ দুভাবে করা হয়েছে—কখনও কোনো সাময়িক পত্রিকা বা সাংস্সৃতিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রচিত প্রবন্ধ ধারা, কখনও বা কোনো দেশনেতা বা সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা কোনো গোষ্ঠীকে ভিত্তি করে রচিত প্রবন্ধ ধারা। এই ধরনের সাময়িক পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বঙ্গদর্শন, ভারতী, বঙ্গবাসী, সাধনা, সাহিত্য, প্রবাসী, নব পর্যায় বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র, বিচিত্রা প্রভৃতি। এক-একজন চিন্তাবিদ্ ও লেখককে অবলম্বন করে বাংলা প্রবন্ধের যুগ বিভাগ এই ভাবে করা যায় ঃ রামমোহনের যুগ, অক্ষময়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে যুগ, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ ; রবীন্দ্রনাথের যুগ। প্রত্যেক যুগেরই যুগ নায়কদের সঙ্গে ছিলেন বহু লেখক-লেখিকা। এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল, বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার গোষ্ঠীই হোক, আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোনো যুগই হোক, দুয়ের মধ্যে দিয়েই বাঙালি মানসের এক সার্বিক প্রকাশ ঘটেছে, অনেক সময়েই এই দুই দিকের মধ্যে সংযোগও লক্ষ করা গেছে। একদিনেই সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রূপ (Form) রূপে প্রবন্ধ সাহিত্যের বিশিষ্টতাকে অর্জন করা বাঙালির পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেমন বাংলা ছোটোগল্পের প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রের একটি মূল্যবান ভূমিকা ছিল, প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও সেইরকম। সাময়িক পত্র সমসাময়িক বিবিধ-বিচিত্র প্রসঙ্গ-ঘটনা-তথ্যকে যেমন আশ্রয় করে, তেমনি এক সংখ্যাতেই সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে (ধারাবাহিক প্রবন্ধ ব্যতীত) এই দায়িত্ব ও স্বীকার করে। ফলে বাংলা প্রবন্ধের বিষয় ও দৈর্ঘ্য, এইভাবে নিরূপিত হতে থাকে। অপরদিকে যুগনায়কগণ তাঁদের বিশিষ্ট ভাবনা-চিন্তাকে প্রবন্ধে দিতে থাকেন, সঙ্গে থাকতেন তাঁদের সহযোগীগণ। অবশ্য এসব কথা সাধারণভাবে বলা হল, ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। এইভাবে দুদিক থেকে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের অগ্রগতি ঘটতে থাকে।

রামমোহনের যুগে স্বয়ং রামমোহন এবং সে যুগের অন্যান্য লেখকেরা যে প্রবন্ধধারার সূচনা করেন, তাকে মূলত Polemic বা বিতর্কমূলক প্রবন্ধ সাহিত্য বলা যায়। নিজের মত প্রতিষ্ঠা এবং অপরের মত খণ্ডন এগুলির লক্ষ্য ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকগণের প্রয়াস এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতির নাম করা যায়। এঁদের প্রবন্ধের বিষয় যেসব বিতর্কমূলক ভাষাও তেমনি সংস্কৃত ঘেষা। রামমোহনের পক্ষে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—ব্রজমোহন মজুমদার, বিপক্ষের লেখক—গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশও রামমোহন পক্ষীয় লেখক। আজ এঁদের সকলের রচনাই বিস্মৃতি গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এই যুগের খ্রিস্টান লেখক রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানচর্চার কারণে এবং নানাবিধ আলোচনার কারণ এখনও বিস্মৃত হয়নি।

অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের যেমন বিবর্ধন ঘটেছে, বিষয়গত বিস্তার যেমন ঘটেছে, তা অবিস্মরণীয়। বিশেষত বিদ্যাসাগরের অবদান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। এই সময়কার অপর দুই শ্রেষ্ঠ লেখক হলেন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এই যুগে নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ঘটনা এঁদেরও বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল, তার ফল তাঁদের প্রবন্ধে ধরা পড়েছে। অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান-চেতনা, প্রবন্ধের রূপকল্প সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা বাংলা গদ্যের সহজরূপের অনুবর্তন তাঁকে অমর করে রেখেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৌলিক রচনা তেমন লেখেননি বটে কিন্তু বাংলা গদ্যের শিল্পরূপটিকে তিনিই প্রথম অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। নায়ক রূপে তিনি এবং তাঁর প্রতিভাধর অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে এই যুগ। পরবর্তী অংশে এই যুগ নিয়ে আলোচনা করছি।

রবীন্দ্রযুগের পত্তন ধরা যায় মোটামুটিভাবে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত। তিনিও জীবনের পর্বে নানা সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, সম্পাদক রূপে তিনিই সেখানকার প্রধান লেখক রূপে বিদ্যমান। কিংবা কখনও বা অন্য কোনো সাময়িক পত্রের লেখক। 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধে-সমালোচনাদি বের হয়, নিজেও পরবর্তীকালে এই পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। তাঁর নিজ-সম্পাদিত পত্রিকা হল, 'সাধনা', 'নব-পর্যায় বঙ্গদর্শন', 'ভাণ্ডার'। এছাড়া 'হিতবাদী,' 'বসুমতী', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা' প্রভৃতিতেও তিনি লিখেছেন। এমন কি, বিরোধী ভাবনার পত্রিকা 'সাহিত্য,' 'নারায়ণ' প্রভৃতিতেও তিনি লিখেছেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এবং সাহিত্য আন্দোলন নিয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন, আজ সেগুলি ইতিহাসের বিষয় হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ধারায় আছে তাঁর নিজস্ব সাহিত্য তত্ত্ব, সাহিত্য ভাবনা, এবং সাহিত্য জীবনের পরিচয়। 'লোকসাহিত্য' নিয়ে বিশদ আলোচনা তার প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রবন্ধের রূপকল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তিনিই বাঙলায় পত্র-প্রবন্ধের ধারাটিকে সমৃদ্ধ করেন। তারপর প্রাচীন ভারত ও ভারতের সাহিত্য নিয়ে তাঁর প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। বিদেশি সাহিত্য, সাহিত্যিক এবং সাহিত্য প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর প্রবন্ধাবলি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক, তাঁর অধ্যয়নশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধের কয়েকটি বিশেষত্ব এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, তাঁর সৃষ্টিমূলক সাহিত্যেক তিনি যা বলতে তাঁর প্রবন্ধেও তার জের তিনি টেনেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রবন্ধের ভাষারীতিতে কাব্যের ছোঁয়া অনেকের কাছেই পছন্দসই ছিল না। তৃতীয়ত, বহুক্ষেত্রে তাঁর প্রবন্ধ ব্যক্তিগত ভাবনামূলক হয়ে উঠেছে। অবশ্য পরবর্তীকালে এই ধরনের প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদরূপে গৃহীত হয়েছে।

রবীন্দ্রযুগের অন্যান্য প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছে স্বামী বিবেকানন্দ (তাঁর প্রবন্ধের কথা বলে বলেছি), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী (তাঁর প্রবন্ধের কথা পরে বলেছি), দীনেশচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, অজিত কুমার চক্রবর্তী, ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ এবং এইসব প্রতিভাধর প্রবন্ধকারগণ মিলিতভাবে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এক স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠা করেন।

রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগেও বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। প্রবন্ধের বিষয় ও রূপকল্প নিয়ে, ভাষা ও প্রকাশকাল নিয়ে এঁরাও নানা পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে আছেন, রাজশেখর বসু, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, অন্নদাশঙ্কর রায় (এঁরা প্রবন্ধের কথা পরে বলেছি) প্রভৃতি এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রতিভাধর লেখক-লেখিকাগণ। বাংলা প্রবন্ধের ধারা নব-নব পথে বিস্তৃত ও অগ্রসর হয়ে চলেছে।

৪২.৫ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্য

বঙ্কিচন্দ্রের মূলত ঔপন্যাসিক। কিন্তু তাঁর প্রতিভা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও সমভাবে সার্থক হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি যেন তত্ত্ব-দর্শনের প্রকাশক, আর তাঁর উপন্যাসবলি যেন সেই তত্ত্ব-দর্শনের রসতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। এর ফলে তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধ যেন একে অপরের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার', 'নবজীবন'—প্রধানত এই তিনটি সাময়িক পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। নানা বিষয়কে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ লিখেছেন। ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধ তাঁর একটি প্রিয় বিষয় ছিল। সাহিত-তত্ত্ব, সমালোচনা তত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি চারুকলা—সকল দিকেই তিনি সমান দক্ষতায় বিচরণ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য—সবই তাঁর আলোচ্য বিষয় হয়েছিল। তিনিই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনা পদ্ধতিকে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। পাশ্চাত্য দর্শনতত্ত্বকে তিনি তাঁর আলোচ্য একটি দিক করে তুলেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার একটি বিভাগ ছিল সমসাময়িক পত্র-পুস্তকের সমালোচনা। এই বিভাগে তিনি অসম্পূর্ণ

লেখকদের নানাভাবে সমালোচনা করেছেন, ফলে তাঁরাও এতে উপকৃত হয়েছেন। কেবল একা বঙ্কিমচন্দ্রই নন, সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহযোগীগণ, তাঁরা ছিলেন এক-একজন বিশিষ্ট ও সমর্থক লেখক। এর ফলে বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রবর্তন ঘটে। এঁদের মিলিত চেষ্টায় বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে জোয়ার আসে। স্বাদেশিকতা ছিল এই গোষ্ঠীর মূল মন্ত্র। দেশের স্বাধীনতা এবং সাহিত্যের সমৃদ্ধি—এই দুই দিক তাদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করত।

ঔপন্যাসিক রূপে বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যের একটি শিল্পিত রূপকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। গদ্যের সেই শিল্পিত রূপটিই তাঁর প্রবন্ধের গদ্যের মধ্যেও গৃহীত হল। ফলে তার প্রবন্ধ সাধারণ মানুষের কাছেও সহজ-বোধ্য হয়ে উঠল। দ্বিতীয়ত, যে স্মিতহাস্য রসবোধ তাঁর উপন্যাসের মধ্যে ধরা পড়েছে কিংবা সে সপ্রতিভতা, তাঁর প্রবন্ধেও তা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হল। তৃতীয়ত, যুক্তিবোধ সেই প্রবন্ধকে আরো আর্কষণীয় করে তুলল। চতুর্থত, তাঁর প্রবন্ধের আয়তন। সাময়িক পত্রের প্রয়োজনপূরণের জন্য, একটি বিশিষ্ট আয়তনের মধ্যে প্রবন্ধে সীমা রক্ষা করতে হয়। কেবল তাই নয়। একটি বিশিষ্ট সীমার মধ্যে একটি প্রবন্ধের সুসম্পূর্ণতার প্রসঙ্গটিও আছে। অকারণে দীর্ঘ বা অতিভাষণে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লে একটি প্রবন্ধের গঠনগত সুষমাও যে ব্যাহত হয়, তা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধধারা থেকেই বাঙালি পাঠক বুঝেছে। তাঁর অনুগামীরাও এ বিষয়ে তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন। একদিকে প্রবন্ধের গদ্যকে হতে হবে সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য, অন্যদিকে গঠনের ক্ষেত্রে চাই একটি নির্দিষ্ট অবয়বের মধ্যে সুষমাময় সম্পূর্ণতা। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে কোনো প্রবন্ধকার এই দুই দিককে এক করে তুলতে পারেননি।

সমসাময়িক যেসব গ্রন্থের তিনি সমালোচনা করতেন, সেই সব গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক সাহিত্যতত্ত্বের দিকটিকেও তিনি তুলে ধরতেন। এর ফলে তখনকার পাঠক সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারতেন। যেমন ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটক নিয়ে আলোচনা কালে, কিংবা জয়দেবের কবিকৃতি আলোচনা করেছেন বিদ্যাপতির সঙ্গে। কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে গীতিকবিতার স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। এই ভাবে তিনি তাঁর গ্রন্থ সমালোচনাকে একটি সাহিত্যিক মাত্রা প্রদান করেছেন। এ কারণেই গ্রন্থ সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি সমসাময়িকতার সীমা লঙ্ঘন করে চিরায়ত সাহিত্যে পরিণত হতে পেরেছে।

তবে, একথা বলাই বাহুল্য, তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে মূল শক্তি হল—তাঁরই অন্তর্দৃষ্টি, তাঁরই সৃষ্টি নৈপুণ্য। 'বিবিধ প্রবন্ধে' যখন তিনি 'প্রাচীনা এবং নবীনা' লেখেন তখন তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তা বেরিয়ে আসে। আবার, 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি' রচনা কালে তিনি কথোপকথনের রীতি অবলম্বন করেন। 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধটি যে রীতিতে লিখিত, 'ভালবাসার অত্যাচার' ঠিক সেই একই রীতিতে লিখিত নয়। প্রবন্ধের বিষয় অনুসারে তার প্রকাশরীতিও যে ভিন্ন হবে, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। 'দ্রৌপদী' প্রম্বন্ধে দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করবার জন্য আর এক রীতির আশ্রয় নিয়েছেন—এখানে মহাভারতের প্রাসঙ্গিক আখ্যানের অনুসরণ করে প্রবন্ধের সার গ্রহণে পাঠকের সহায়ক হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলির মধ্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

১। বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬)

২। প্রবন্ধপুস্তক (১৮৭৯)

৩। বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ভাগ, ১৮৮৭ বিবিধ সমালোচনা ও প্রবন্ধপুস্তক গ্রন্থ দুখানির সম্মিলিত রূপ)

৪। বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৯২)

৫। লোকরহস্য (১৮৭৪)

৬। বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫)

৭। সাম্য (১৮৭৯)

৮। কৃষ্ণচরিত্র (প্রথম ভাগ) (১৮৮৬)

(আকারে দীর্ঘ রচনাকে এখানে ধরা হয়নি)

বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী লেখকদের মধ্যে আছেন ঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু, রামদাস সেন, চন্দ্রশেখর বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এছাড়া অন্যান্য পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি।

৪২.৬ মূলপাঠ ঃ 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধের প্রথমাংশ

কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ন সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে দুই ব্যক্তি কখন এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ, সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, কাব্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন।

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলি গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য ; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা অংশবিশেষ কাব্য ; স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি ; নাটককে আমরা কাব্যমধ্যে গণ্য করি, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা ১ম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি ; ২য় আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য ; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপালবধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত ; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত ; এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য়, খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।

দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয়, এবং রঙ্গাঙ্গানে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনের গ্রন্থিত এবং অভিনয়োপযোগী, তাহাই যে নাটক বা তচ্ছেণীস্থ, এমত নহে। এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রন্থিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে অনেকগুলিই নাটক নহে। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনেকগুলির উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনের গ্রন্থিত কিন্তু বস্তুত নাটক নহে। "Comus", "Manfred", "Faust" ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরেজি ও গ্রিক ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। পক্ষান্তরে গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় "Bride of Lammermoor" কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে ; অথবা গীতপরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে দেখা গিয়াছে, অনেক খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে। যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রন্থিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে "Excursion" এবং "Childe Harold" কে ঐ না দিতে হয়। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ঐ দুই কাব্য খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ মাত্র।

খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন।

৪২.৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে সাহিত্যিক রচনামাত্রকেই 'কাব্য' বলবার প্রথা ছিল। এ প্রথা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির মধ্যেও দেখা গেছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই, রামায়ণ মহাভারত 'ইতিহাস' বলে খ্যাত হলেও, এ দুটিকে কাব্য বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত 'পুরাণ' হলেও তার অংশ বিশেষকে কাব্য বলেন। আধুনিক যুগের পাঠক রামায়ণ-মহাভারতকে 'ইতিহাস' বলে স্বীকার করুন বা না করুণ, কাব্য বলেই স্বীকার করেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আধুনিক পাঠকের মতগত পার্থক্য তেমন নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে সার ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসগুলিকে 'উৎকৃষ্ট কাব্য' বলেন, তা আধুনিক যুগের পাঠক স্বীকার করবেন না। এগুলিকে তাঁরা 'উপন্যাস' বলেই মানবেন। Walter Scott (১৭৭১-১৮৩২) অষ্টাদশ শতাব্দীর ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজের রোমান্টিকতাকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। ইতিহাসকে তিনি রোমান্টিক রূপ দান করে উপন্যাসকে এক বিস্তৃত পটভূমিকায় বিন্যস্ত করেছিলেন। হয়তো রোমান্টিকতার এই বিস্তৃতির কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের উপন্যাসগুলিকে সরাসরি 'কাব্য' বলেছেন ; আধুনিক পাঠক এই ধরনের উপন্যাসকে রোমান্সধর্মী উপন্যাস' আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু সরাসরি কাব্য বলবেন না। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে উপন্যাসের এত বৈচিত্র্য এবং সে অনুযায়ী পারিভাষিক নাম প্রদানের প্রথা সৃষ্টি হয়নি। আধুনিক পাঠক এক-একটি সাহিত্যে রূপের নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত বলেই এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সহমত পোষণ করা সম্ভব হবে না।

নিতান্ত অক্লেশে অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'নাটককে আমরা কাব্য মধ্যে গণ্য করি।' কিন্তু নাটকের মধ্যেও আজ নানা রূপ-বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে ঃ কাব্য নাট্য, নাট্যকাব্য রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটি গদ্যে লেখা, তথাপি তা কবিতার কাছাকাছি। গদ্য কাব্যের প্রবর্তনের পর গদ্যে-পদ্যে ভেদ অনেকটাই ঘুচে গেছে ; কাজেই বিশেষ বিশেষ সাহিত্যরীতির আশ্রয়ে লেখা নাটক কবিতার কাছাকাছি, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতানুসারে, নাটক মাত্রই কাব্য,—আধুনিক পাঠক তা নাও মানতে পারেন। নাটক বিচারের দৃষ্টিকোণ আজ যেমন পরিবর্তিত, নাট্যকারের দিক থেকে তার রচনারীতিও আজ ঠিক তেমনটি নেই।

এইখানে বঙ্গিমচন্দ্রের দৃষ্টিকোণটিকে সমকালীন পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ হয়তো প্রভাবিত করেছে। এই দৃষ্টিকোণ অনুসারে খাঁটি নাটক কেবল গ্রিক বা ইংরেজি ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় নেই। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' বা ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত'—এই দৃষ্টিতে নাটক নয়, কাব্য। Goethe-র মত উদ্ধৃত করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'প্রকৃত নাটকের পক্ষে কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। গ্যেটে নিজে কবি, দীর্ঘদিন ধরে তিনি "Faust" নাটকটি লিখেছেন, ফাউস্টের জীবনের ট্র্যাডেজিকে তুলে ধরেছেন। হয়তো গ্যেটের সময় Reading drama এবং Stage drams-র পার্থক্য তেমন প্রবল ছিল না ; আজকের সমালোচক Faust কে Reading drama ধরে নিয়ে তার মঞ্চগত দিক উপেক্ষাও করতে পারেন, কিন্তু 'কথোপকথনে' গ্রন্থনা তো করতেই হবে। আজকের সমালোচক নাটক বলতে তার মঞ্চায়ন ও আভিনায়িক দিককেই মুখ্য বলে মানবেন এবং সেই কারণে কাব্য নাট্যেরও অভিনয় আজ বিরল নয়। Closet বা Reading drama রূপে আজ নতুন এক ধারার নাটকেরই সৃষ্টি হয়েছে। Absurd নাটক পাঠ্য নাটক রূপে বেশি সফল হলেও তারও অভিনেয়তা আজ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই আজ যেখানে পাঠ্য ও অভিনয়—দু'ধরনের নাটকের প্রবর্তন ঘটেছে' সেখানে গ্যেটে কথিত এবং বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থিত, কথোপকথন বিহীন, অভিনয়শূন্য নাটকের কল্পনা করবেন না।

আসলে এই ধরনের পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণের অনুসারী গবেষক-শিল্পী-সমালোচকগণ নাটককে খোঁজেন কোনো রূপের মধ্যে নয়, রচনার আত্মার মধ্যে। তাই কথোপকথন এবং অভিনয় নাটকের পক্ষে অপরিহার্য বলে তাঁরা মানেন না। নাটকের সেই আত্মা লুকিয়ে আছে কাব্যের মধ্যে, আখ্যায়িকার মধ্যে এবং খাঁটি নাটকের মধ্যে তো বটেই। এই জন্য তাঁরা গদ্য-পদ্য, অভিনয়-কথোপকথন প্রভৃতির বালাই স্বীকার করেন না। অথচ, আধুনিক যুগেই, পাশ্চাত্য

জগতে নাটক বিচার করতে গিয়ে কাহিনী-ঘটনা-চরিত্রের দ্বন্দ্ব-বিবর্তনকে অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে রূপদানকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয়। অবশ্য নাটকের ভাব ও রস অনুযায়ী তার অভিনয় ও মঞ্চব্যবস্থাও ভিন্ন হবে। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'রঙ্গামঞ্চ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য রঙ্গামঞ্চকে প্রাধান্য দিতে চাননি।

এই পটভূকিায় বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকোণটি বিচার্য। 'বিবিধ প্রবন্ধে'-রই অন্তর্ভুক্ত 'শকুন্তলা', 'মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধে এ বিষয়ে আর একটু বেশি আলোচনা করেছেন। শেকসপিয়র এবং কালিদাসের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নাট্যরীতির তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন, শকুন্তলার মনোভাব কালিদাসের টীকা ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না ; কিন্তু ওথেলোর মনোভাব শেকসপিয়র ওথেলোরই কর্ম ও সংলাপের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ শেকসপিয়রীয় রীতিকেই তিনি খাঁটি নাট্যরীতি বলে মনে করেন। ভারতবর্ষে নাটককে সেখানে বলা হয়—'দৃশ্যকাব্য'। অর্থাৎ কাব্যত্বই এখানে প্রধান নাটকত্ব নয়। কেন এই পার্থক্য বঙ্কিমচন্দ্র তার উত্তর দেননি। আমাদের মতে এর উত্তর এই ঃ ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে নাটককে দেখা হয়েছে রসসৃষ্টির উপায় রূপে ; কাহিনী-ঘটনা-চরিত্র সংস্থা-পরের দিক থেকে নয়। রসসৃষ্টিই এখানে নাটকের মূল লক্ষ্য বলে কাব্যত্ব এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। একথা এখানে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, যে, খাঁটি নাটকের মাধ্যমেও রসসৃষ্টি হতে পারে, হয়েও থাকে। রসশাস্ত্রের নির্দেশ মান্য করবার জন্যই নাটক 'দৃশ্যকাব্য' হয়ে পড়েছে কিনা, কে জানে।

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটির প্রথম অংশ নাটক এবং কাব্যের আপেক্ষিক প্রাধান্য নিয়ে ব্যাপৃত। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাহিত্য জগৎ থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত চয়ন করে আপন বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন। তিনি জন মিল্টনের Comus (সম্পূর্ণ নাম—Mark of Comus, ১৬৩৪ খ্রিঃ), George Gordon Byron-এর (১৭৮৮-১৮২৪, Lord Byron নামে সমধিক পরিচিত) Canfred (Faust-এর Parody বা লালিকা রূপে রচিত) নাটকগুলির কথা বলেছেন। বায়রনেরই Childe, Harold (সম্পূর্ণ নাম—Childe Harold's Pilgrimage; প্রথম দুই সন ১৮১২ খ্রিঃ, শেষ দুই সন ১৮১৬-১৮১৮) নাটকটির কথাও বলেছেন। Mark of Comus, নাম থেকেই বোঝা যায় এটি মুখোশ-নাটক ; নাচ-গান নাটকে পূর্ণ। সমালোচকেরা এটিকে Pastoral drama বলে থাকেন। আমোদই এর মূল লক্ষ্য। এ ছাড়া উল্লেখ করেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের (The) Excursion (১৮১৪ খ্রিঃ)। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে The Recluse নামে তাঁর যে কাব্যগ্রন্থটি বের হয় তার প্রথম পর্বের নাম The Prelude, দ্বিতীয় পর্বের নাম The Excursion তৃতীয় অংশটি অলিখিত। ওয়াল্টার স্কটের একটি প্রেমের উপন্যাস 'The Bride of Lammermor' তখন বাঙালির কাছে একটি প্রিয় উপন্যাস ; 'নরনারী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও এই উপন্যাসটির কথা বলেছেন।

উপরে উল্লিখিত এই বিভিন্ন রচনাগুলির মধ্যে কাব্য ও নাটকের মাত্রা-পরিমাণ অন্বেষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রথিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য" নাম দেওয়া যায়, 'তবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের Excursion এবং বায়রনের Childe Harold তাই। আবার স্কটের লেখা উপন্যাস Bride of Lammermoor কে তিনি 'নাটক' বলেন, যেমন, উপাখ্যানকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য বলেন (এ দুয়ের মধ্যে কিন্তু তিনি পার্থক্য করলেন না), তেমনি উপন্যাসকেও 'নাটক' বলেন। আবার, Comus, Manfred Faust, যা, কথোপকথনের আকারে লিখিত, সে সব রচনাকে তিনি 'কাব্য' বলেন। অর্থাৎ রচনার বাহ্যিক আকৃতি-অবয়ব দেখে তিনি তার সাহিত্যিক প্রকৃতি নিরূপণ করতে চান না। রূপকে অতিক্রম করে তার আত্মাতে পৌঁছতে চান।

এইভাবে কাব্যের সঙ্গে নাটকের ভেদ বিশ্লেষণ করে কাব্যেরই একটি অঙ্গ 'গীতিকাব্যে'র ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছে। কাজেই এই ভূমিকা অংশটির একটি অপরিহার্যতা আছে। এই অংশটিকে প্রথম ধাপ বলে মেনে নিয়ে পাঠক মূল আলোচ্য ক্ষেত্রে উপনীত হতে পারবেন।

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে সাহিত্য মাত্রই 'কাব্য' এবং সেই কাব্য আবার তিন ধরনের ঃ দৃশ্যকাব্য (নাটক) ; আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য ; আর যা কিছুই এ দুয়ের বাহিরে, তাই 'খণ্ডকাব্য'। খণ্ডকাব্যের মধ্যেও যে নানা শ্রেণী

আছে, রকমফের আছে, এই বিভাগ অনুসারে তা ধরা পড়ে না। এ বিভাগ অতি-ব্যপ্তি দোষে দুষ্ট। ইউরোপে যাকে 'লিরিক' বলে খণ্ডকাব্য তার কাছাকাছি, কিন্তু সর্বাংশে অভিন্ন নয়। প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ বঙ্কিমচন্দ্র লিরিক কবিতা রূপে খণ্ডকাব্যের যে টুকু অংশ গ্রহণীয়, তার কথা বলেছেন।

৪২.৮ সারাংশ (প্রথম অংশের)

আমাদের দেশের আলংকারিকেরা সাহিত্যমাত্রই 'কাব্য' বলে মনে করতেন। 'কাব্য' বলতে তাঁরা একটি ব্যাপক ধারণা পোষণ করতেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'কাব্য' কে তাঁরা তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন ঃ ক) দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটক ; খ) আখ্যান কাব্য, অর্থাৎ গদ্যে রচিত গল্পমূলক রচনা ; গ) খণ্ডকাব্য এবং মহাকাব্য। এই তিন ধরনের রচনার মধ্যে যে রূপগত পার্থক্য আছে, যে কেউ তা বুঝে নিতে পারেন। কিন্তু সেই রূপগত বাইরের পার্থক্যটাই এদের পরস্পরের সঙ্গে পার্থক্যের মূল দিক নয়। যেমন, কথোপকথনে রচিত গ্রন্থ মাত্রই নাটক নয় ; আবার অনেক আখ্যানও নাটকের আকারে রচিত হতে পারে, কিংবা অনেকগুলি খণ্ডকাব্যের সমষ্টি। এই খণ্ডকাব্যেরই একটি বিশেষ দিক ইউরোপে 'লিরিক' নামে পরিচিত। এই 'লিরিক' বা গীতিকবিতার স্বরূপ সন্ধানই আলোচ্য প্রবন্ধটির লক্ষ্য। ভারতের 'খণ্ডকাব্য' এবং ইউরোপের 'লিরিক' সর্বাংশে এবং সর্বত্র এক বা অভিন্ন নয়। এইভাবে প্রবন্ধটির ভূমিকা করে লেখক মূল বক্তব্যের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। এই পর্যন্ত এই প্রবন্ধের প্রথম অংশ।

৪২.৯ অনুশীলনী-১

ক. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন (২০০ শব্দের মধ্যে)

১। বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক ও চাকুরি জীবনের পরিচয় দিন।

২। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি উপন্যাস এবং প্রথম তিনটি বাংলা উপন্যাসের নাম করুন এবং মন্তব্য করুন।

৩। কালানুক্রমিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনটি উপন্যাসের নাম করুন এবং এগুলির মুখ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৪। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রসঙ্গে মন্তব্য করুন।

৫। 'প্রচার' এবং 'নবজীবন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশিষ্ট রচনাগুলি প্রকাশিত, তার বিবরণ দিন।

৬। 'প্রবন্ধ' কথাটির মূল অর্থ কী ? ক' ধরনের প্রবন্ধে আছে ?

৭। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক উল্লেখ করুন। তাঁর সহযোগী লেখকগণের নাম কী ?

৮। প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিতে 'কাব্য' বলতে কী বোঝান হ'ত ? তখন 'কাব্য' কীভাবে বিভক্ত করা হত ?

৯। এই রচনাগুলির পরিচয় দিন ঃ Faust, comus' Manfred, childe Harold.

১০। Walter Scott এবং Bride of Lammermoor প্রসঙ্গে আলোকপাত করুন।

খ. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত উত্তর দিন (১০০ শব্দের মধ্যে) ঃ

১। বাংলা বিষয়বস্তু প্রধান (objective) প্রবন্ধ ধারার উদ্ভব ও পরিপুষ্টির পেছনের কারণগুলি নির্দেশ করুন।

২। বাংলা বিষয়বস্তু প্রধান (objective) প্রবন্ধের ধারাটিকে কী কী ভাবে বিভক্ত করা যায় ?

৩। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের পূর্ণ পরিচয় এবং প্রবন্ধকার রূপে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করুন।

৫। কাব্য এবং নাটকের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে পার্থক্যের কথা বলেছেন, উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দিন। Reading drama এবং stage drama-র মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

৪২.১০ মূলপাঠ ঃ 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক নাম দিতে হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক। কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক, সেখানে নামও পৃথক হওয়া আবশ্যক। যদি এমত কোন বস্তু থাকে যে, তাঁহার জন্য গীতিকাব্য নামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঋণী হইতে হইবে।

গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। "আঃ" এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। "তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম!" ইহা শুধু বলিলে, দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিতে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্যপ্রযুক্ত, মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয় এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না। অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।

গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস করিলেই গীতের পরিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানই ছন্দের সৃষ্টি।

গীতের পারিপাট্যজন্য আবশ্যক দুইটি-স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য। এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য ; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল ; আগের গীতিকাব্য রচিতই হতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধূসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।

যখন হৃদয়, কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়, স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকুই গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যকতির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে ; ব্যকত্বি এবং অব্যক্তব্য, উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটককর্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে যে গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে ; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য বক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।

উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ে উত্তর উদাহরণ উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতাবিসর্জ্জনকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা

যায়, তাহার আলোচনা করিলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; বক্তব্য এবং অবক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্য্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন, এবং তত্তৎ কার্য্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাবব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতিকৃত ঐ রামবিলাপের সঙ্গে ডেসডিমোনা বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও এ কথা বুঝা যাইবে। শেকসপিয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্য্যর্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। ব্যক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক রেখা যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়বের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতির ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্র গুণ দুঃখ সেকসপিয়রের ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন।।

সহজেই অনুমেয় যে, তাহা বক্তব্য, তাহা পর সম্বন্ধীয় বা কোন কার্য্যোদ্দিষ্ট, যাহা অবক্তব্য, তাহা আত্মচিত্র সম্বন্ধীয় ; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না, এমনত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনুষঙ্গিকতাবশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।

৪২.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

'গীতিকাব্য' ('অবকাশরঞ্জিনী' নামে 'বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত। বৈশাখ, ১৮২০। এটি নবীনচন্দ্র সেনের একটি গীতিকাব্য সঙ্কলন। এই গ্রন্থ সমালোচনা উপলক্ষে এটি লিখিত) প্রবন্ধটি যখন লিখিত হয়, তখন 'লিরিক' বা গীতিকবিতা সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালির মনে কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রকে গীতিকবিতা সম্পর্কে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে আলোচনা শুরু করতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি অতি সুন্দরভাবে গীতিকবিতার একেবারে মূল ধারণায় গিয়ে পৌঁছেছেন। পাশ্চাত্য সমালোচকগণ গীতিকবিতাকে যে Lyre (Lyrea) বীণাজাতীয় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গেয় রচনা বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা প্রথমেই উল্লেখ করেছেন এবং সেখান থেকেই তাঁর আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। মূলত গ্রিকগণ ছিল এই ধারণার পরিপোষক। Lyre (Lyra) থেকেই Lyric শব্দের উদ্ভব হয়েছে। ভাবের দিক থেকে পাশ্চাত্য জগতে গীতিকবিতাকে 'Reflexive' বা 'আত্মবাচক' বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র একেই বলেছেন 'আত্মচিত্তসম্বন্ধীয়'। গীতিকবিতার স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিভা ও সাহিত্য রসবোধের বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের মনের তাবৎ ভাবকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছেন ঃ ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য। ব্যক্তব্য অংশ নাট্যকারের ক্ষেত্রে ; অব্যক্তব্য অংশ লিরিক কবির ক্ষেত্র। অর্থাৎ কবির 'আত্মচিত্তসম্বন্ধীয়', অব্যক্তব্য বিষয়ই গীতিকাব্যের বিষয়। তবে, কেবল একা কবিরই আত্মবিষয়ক হবে, এমন কোনো মানে নেই। তা একক একজন বক্তার আলোচ্য বিষয়ও হতে পারে। এই পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা অতি সুন্দর এবং যথার্থ। কিন্তু সেই অব্যক্তব্য অংশের প্রকাশকাল ও প্রকরণ সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্ট কোনো আলোকপাত করেননি। কিংবা, ভাবের বৈচিত্র এবং প্রকাশকলার প্রকরণ অনুযায়ী গীতিকবিতার শ্রেণীবিভাগও তিনি করেননি। অবশ্য, বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে বাংলা ভাষায় গীতিকবিতা নিয়ে এই আলোচনা করেছিলেন, সে সময়ে এর চেয়ে বেশি কিছু করাও সম্ভব ছিল না। এই দিক থেকে বিচার করে আজ তাঁর প্রবন্ধটিকে আংশিকভাবে অসম্পূর্ণ বলে মনে হলেও তাঁকে আমরা দোষ দিতে পারি না।

একদা গীতিকবিতার স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, 'একটুখানির মধ্যে অনেকখানি ভাবের বিকাশ'। 'একটুখানি' কথাটির মধ্যে গীতিকবিতার সংজ্ঞিপ্ত সংহত-তীক্ষ্ণ-যথাযথ রূপগত পরিসরের কথাটি আছে। গীতিকবিতার এই

বিশেষ রূপবন্ধটিকে সবার আগে লক্ষ করতে হবে। গীতিকবিতার প্রকরণ বা প্রকাশকলার প্রধান উপকরণ হল ভাষা (শব্দ চয়ন, গীতিময় পদসৃষ্টি), ছন্দ এবং চিত্রকল্প। ভাবের তীক্ষ্ণতা ও প্রসারতা, গভীরতাকে ব্যক্ত করতে সরাসরি ভাষাভঙ্গি অপেক্ষা চিত্রকল্পের আশ্রয় নিতে হবে। ভাষা-ছন্দ-চিত্রকল্প সবই হবে ভাবের প্রকৃত প্রকাশক এবং সেই কারণে অপরিহার্য। নিসর্গজগৎ গীতিকবিতার এটি বড়ো অবলম্বন। নিসর্গজগৎ গীতিকবির মনে নানা তত্ত্ব-ভাবনার সূচনা করে। গীতিকবির আত্মবিশ্লেষণের ফলে কখনো তিনি রোমান্টিক, কখনো বা মিষ্টিক।

আধুনিক যুগে গীতিকবিতার এক নতুন মাত্রা দেখা যাচ্ছে। এখানকার 'গীতিকবিতা' একদিকে পাঠ্য বটে অপরদিকে, সুরসহযোগে তা গেয়ও বটে। এর সুন্দর দৃষ্টান্ত 'গীতাঞ্জলি'র গান-কবিতাগুলি। মূলত এগুলি গান, গানরূপেই রচিত এবং সুরে সমর্পিত। কিন্তু কেউ ইচ্ছে করলে এ রচনাগুলিকে পাঠ্য কবিতারূপেও ব্যবহার করতে পারেন। আধুনিক গীতিকবিতার এই প্রয়োগ বা ব্যাবহারিক দিকটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল গীতিকবিতার তত্ত্বগত দিকটির কথা বলেছেন। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যে গীতিকবিতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটি ব্যক্ত করার অবকাশ পাননি।

আদিতম গীতিকবিতার নিদর্শন মিলেছে ইজিপ্টের পিরামিড-সাহিত্যে অন্ত্যেষ্টির কালে রচিত শোকগীতিরূপে (খ্রি. পূ. ২৬০০)। মৃত রাজার প্রশস্তিরূপে কিংবা দেবতার প্রতি স্তোত্র রূপে। এই পর্বে মেষপালক ও জেলেদের গানও মিলেছে। পরবর্তীকালে (খ্রি. পূ. ১৫০০) সমাধিফলকে উৎকীর্ণ গানও পাওয়া গেছে গীতিকবিতা রূপে। ইজিপ্শীয়দের মতো হিব্রু এবং গ্রীক লিরিকের জন্ম হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। গ্রিক গীতিকবিতা গীত বা মন্ত্রবৎ উচ্চারিত হত, কখনও বা নৃত্যের সঙ্গে।

হোমারের রচনার মধ্যেও গীতিকবিতার বিষয় ও মানসভঙ্গির ইঙ্গিত আছে। খ্রিঃ পূঃ সপ্তম শতকের আগে খাঁটি অর্থে গীতিকবিতার জন্ম হয়নি। পঞ্চম শতাব্দীর পিন্ডার (Pinder) প্রভৃতি গ্রিক কবিগণ এবং ইস্কাইলাস, সফোক্লিস এবং ইউরিপিডস প্রভৃতি নাট্যকারগণ কিছু শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের গীতিকবিতা লেখেন। রোমান গীতিকবিগণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আত্মচরিতমূলক গীতিকবিতা রচনায় প্রবণতা দেখিয়েছেন। খ্রিস্টিয় ৩০০ পর থেকে মধ্যযুগীয় ল্যাটিন গীতিকবিতায় বিষয়বস্তুর বিস্তার এবং শিল্পগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেল। রেনেসাঁসের যুগে ইটালিতে পেত্রার্ক (Petrach) এবং ফ্রান্সের Ronsand গীতিকবিতার যুগের প্রবর্তন করেন, বিশেষত সনেট কবিতায়।

ইংলন্ডেও গীতিকবিতার অনুশীলন চলতে থাকে। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে থেকে Restoration যুগ পর্যন্ত বহু ইংরেজ কবি গীতিকবিতা রচনা করেন। ষোড়শ শতকে এই ধরনের গীতিকবিতার সঙ্কলন বের হতে থাকে। সিডনি (Sidney), স্পেনসার (Spenser), শেকসপিয়ার, বেন জনসন (Ben Janson), হেরিক (Herrick), মিল্টন (Milton) প্রভৃতি এ যুগে গীতিকবি। এঁদের মধ্যে সিডনী, স্পেনসার এবং শেকসপিয়রের সনেটধারা উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতকের কলিন্স (William Collins) এবং গ্রে-র (Thomas Gray) 'ওড' কবিতা গীতিকবিতার একটি বিশেষ ধারাকে সমৃদ্ধ করে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে, রোমান্টিক পর্বে, গোটা ইউরোপেই গীতিকবিতার জোয়ার আসে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে বার্নস (Burns) ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্লেক (Blake) কোলরিজ, বায়রন, শেলী, কীটস ; জার্মানিতে গ্যেটে (Goethe), শিলার (Schiller), ফ্রান্সো ভিকটর হুগো (Victor Hugo), রাশিয়ায় পুশকিন (Pushkin) প্রভৃতি এঁদের মধ্যে আছেন। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সের বোদলেয়ের (Baudelaire) যিনি একজন সাংকেতিকতার প্রবর্তক, ফরাসিভাষায় তিনি কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখেন। অন্যান্য গীতিকবিদের মধ্যে আছেন ঃ য়েটস (W.B. Yeats), এজরা পাউন্ড (Ezra Pound), এলিয়ট (T.S. Eliot), অডেন (W.H. Auden) প্রভৃতি।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার ধারাটি খুবই সমৃদ্ধ। মূলত বিহারীলাল চক্রবর্তী খাঁটি অর্থে এই ধারার সূচনা করলেও, তাঁর আগে রঙ্গালাল বন্দোপাধ্যায়, মাইকেল মধূসূদন দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতঃপর, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং অন্যান্য অসংখ্য কবি

এদিকে লেখনী সঞ্চালন করে। রবীন্দ্রনাথ এসে এই ধারার চরমোৎকর্ষ সূচিত হয়। এই পর্বের আর এক বৈশিষ্ট্য, বাঙালি মহিলা গীতিকবির রচিত গীতিকবিতার প্রচলন। এই সব মহিলা গীতিকবিদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন। দাম্পত্য প্রেম এবং গার্হস্থ্য ধর্ম এঁদের গীতিকবিতার মূল বিষয় ছিল।

৪২.১২ সারাংশ (দ্বিতীয় অংশের)

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশের বক্তব্যকে আমরা তিনটি ধারায় বিভক্ত করে নিতে পারি ঃ প্রথমত, 'গীতিকাব্য' নাম বা অভিধার অর্থ জ্ঞাপন, এর উদ্ভবের ইতিহাস ও স্বরূপ কথন ; দ্বিতীয়ত, সাহিত্যকারের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব অনুসারে সাহিত্যের প্রকাশরীতির দিক থেকে, বঙ্কিমচন্দ্র-কর্তৃক তিন ধরনের কবি-সাহিত্যিকের কল্পনা ; এই ভাবনাটির মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মূল দিক ধরা পড়েছে। তৃতীয়ত, দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবন্ধকারের মূল বক্তব্যকে বিশদ করা।

'গীতিকাব্য' এই সমাসবদ্ধ পদটির বিগ্রহবাক হল ঃ যা 'গীতি', তাই 'কাব্য'। 'গীতি'ও যা 'কাব্য'ও তাই। পাশ্চাত্য Lyric অভিধার বাংলা প্রতিশব্দরূপে বঙ্কিমচন্দ্র এটির প্রর্বতন করেছেন। 'গীতি' বলতে সংগীত ; 'সংগীত' বলতে কণ্ঠস্বরের বিশেষত্বের মাধ্যমে মনের কোনো আবেগের প্রকাশ। আর 'কাব্য' হল ছন্দোময় বাক্য। 'গীত' হওয়াই ছিল 'গীতিকাব্যে'র আদিম উদ্দেশ্য। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, গান গেয়ে না শোনালেও, কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই মনের আবেগকে প্রকাশ করতে পারে এবং তা আনন্দদায়কও বটে, তখন গান গাইবার দিকটি অপ্রধান হয়ে পড়ে। এইভাবে 'গীতিকাব্য' গেয় থেকে অ-গেয় অর্থাৎ নিছক আবৃত্তিযোগ রচনায় পরিণত হয়। ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস প্রকাশ গানেরও লক্ষ্য, কাব্যেরও লক্ষ্য। গীতের যে উদ্দেশ্যে, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। এইভাবে যা গীতি তাই কাব্য—এই অভিন্নতার বোধে এসে পৌঁছান রসিকেরা।

দ্বিতীয় ধারায় বক্তব্যে এসে লেখক সাহিত্যের প্রকাশগত দিক এবং সাহিত্যকারের প্রকাশ ক্ষমতার দিকে কথা তুলেছেন। আমাদের মনের মধ্যে স্নেহ-শোক-ভয় প্রভৃতি নানা ধরনের ভাব থাকে। সাহিত্যের মধ্যে সেই ভাবগুলির সবটাই প্রকাশ করা যায় না। কিছু প্রকাশিত বা ব্যক্ত হয়, কিছু অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত থাকে। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন প্রকাশ সাহিত্যরূপের (যথাঃ নাটক, গীতিকাব্য, মহাকাব্য) কথা তুলেছেন। মানুষের মনের যেসব ভাব ও আবেগ ব্যক্ত করা সম্ভব হয়, সেগুলি ধরা পড়ে নাটকের মধ্যে। পাত্র-পাত্রীর কথা ও কাজের মাধ্যমে ভাবের সেই প্রকাশ ঘটে। কিন্তু যেসব ভাব আবেগ প্রকাশ করা যায় না, ব্যক্ত হয় না, সেগুলির ক্ষেত্র হল গীতিকবিতা। নাটক ও গীতিকবিতার মধ্যে এটি একটি প্রধান পার্থক্যের দিক। এ দুয়ের মিশ্রণ অনুচিত, কারণ, নাটকের নাট্যকার নিজে নিজের কথা বলেন না, চরিত্রগুলির কথাই তুলে ধরেন (অবশ্য পরে যে 'কাব্য নাট্য'-এর উদ্ভব ঘটেছে তাতে গীতিকবিতার কিছু ধর্ম পাওয়া যায়)। আর মহাকাব্য হল,—মানুষের মনের ব্যক্ত-অব্যক্ত দু'দিকেরই প্রকাশস্থল। এইজন্য মহাকাব্য হল,—নাটক ও গীতিকাব্যের মিলিত দিক। এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য—'গীতিকাব্য'। গীতিকবিতার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য লেখক গীতিকবিতাকে মাঝখানে রেখে, তার একদিকে নাটক আর অন্যদিকে মহাকাব্যকে রেখেছেন। এইভাবে তিন ধরনের সাহিত্যরূপের পটভূমিকায় গীতিকবিতার বিশেষত্ব নিরূপণ করেছেন লেখক।

তাঁর বক্তব্যের তৃতীয় ধারায় এসে বঙ্কিমচন্দ্র উদাহরণ দিয়ে উল্লিখিত তত্ত্বটি বিশদ করেছেন। তিনি মহাকবি বাল্মীকি এবং নাট্যকার ভবভূতির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এখানে। আলোচ্য বিষয়টি ধরা যাক সীতাবর্জন কালে এবং তারপরে রামচন্দ্রের মনোভাব। ভবভূতি নাট্যকার। কাজেই তার 'উত্তররামচরিত' নাটকে রামচন্দ্রের মনোভাবেব যেসব দিক প্রকাশযোগ্য বা ব্যক্ত করবার মতো কেবল সেই সীমাতেই তার আবদ্ধ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি নাট্যকারের সীমা লঙ্ঘন করে গীতিকবির রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন। অর্থাৎ, রামচন্দ্রের মনের যেসব দিক অব্যক্ত-অপ্রকাশযোগ্য, যা গীতিকবির ক্ষেত্র, তাও তিনি প্রকাশ করতে গেছেন। উল্টোদিকে বাল্মিকী মহাকবি।

মানবমনের ব্যক্ত-অব্যক্ত দুই ক্ষেত্রেই তার অধিকার। তিনি করেছেনও তাই। প্রবন্ধকারের অভিযোগ, নাটকের মধ্যে গীতিকবিতাকে এনে ফেলে ভবভূতি ঠিক কাজ করেননি। অবশ্য, একথাও তিনি বলেছেন, ঈষৎ মাত্রায় নাটকের মধ্যে গীতিকবিতার অনুপ্রবেশ সহনীয়। মানবমনের ব্যক্তব্য, বিষয়টি হল,—'পরসম্বন্ধীয়' ; আর, অব্যক্তব্য বিষয়টি—'আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়'। গীতিকবিতার বিষয় হল,—'আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়'।

৪২.১৩ অনুশীলনী-২

ক. সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটির দ্বিতীয়াংশে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যকে ক'টি ধারায় বিভক্ত করা যায় ?

২। 'গীতিকাব্য' পদটির বিগ্রহবাক্য বলুন।

৩। কোন্ পাশ্চাত্য শব্দের প্রতিশব্দ রূপে বাংলা 'গীতিকাব্য' অভিধাটি প্রদত্ত হয়েছে ?

৪। সীতা বর্জন কালে রামচন্দ্রের মনোভাব ব্যক্ত করতে বাল্মীকি ও ভবভূতির শিল্পরূপের সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৫। 'পরসম্বন্ধীয় এবং আত্মচিত্তসম্বন্ধীয়' বিষয় দুটির পার্থক্য বোঝান।

৬। 'বঙ্গদর্শনে'র কোন্ সংখ্যায় 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটি বের হয় ? তখন এর নাম কী ছিল ?

৭। আদিতম গীতিকবিতার নির্দশন মিলেছে কোথা থেকে ?

৮। ইংলন্ডের কয়েকজন গীতিকবির নাম করুন।

৯। ঊনবিংশ শতকের কয়েকজন বাঙালি গীতিকবির নাম উল্লেখ করুন।

১০। ঊনবিংশ শতকের বাঙালি মহিলা গীতিকবিদের বিষয়বস্তু প্রধানত কী ছিল ?

খ. বিশদ আলোচনা করুন ঃ

১। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে 'গীতিকাব্যে'র সংজ্ঞা দিন।

২। গীতিকবিতা এবং নাটকের বিষয়বস্তুর তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩। গীতিকবিতার রূপবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৪। পাশ্চাত্য গীতিকবিতার ক্রমবিকাশের রূপরেখাটি তুলে ধরুন।

৪২.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী পর্ব)—ড. সুকুমার সেন।

২) বাঙ্গালা প্রবন্ধ—ড. সুকুমার সেন।

৩) আধুনিক বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারা—অধীর দে।

৪) সাহিত্য সন্দর্শন—শ্রীশ চন্দ্র দাস।

৫) J.A. Cuddon (সম্পাদিত)—A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory.

৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—ভূদেব চৌধুরী (দ্বিতীয় পর্যায়)